গুরুপ্রসাদ

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
গুরু কৃপাহি কেবলম (১)	৪
গুরু কৃপাহি কেবলম (২)	৬
গুরু কৃপাহি কেবলম (৩)	৮
দোলযাত্রা, গৌরপূর্ণিমা ও হোলি কথা	১৬
ব্রজে হোলি দর্শনে গোপিনীগণ	২৫
প্রাণ হরণ	২৮

॥গুরু কৃপাহি কেবলম (১)॥

স্মরণীয় সরস্বতী পুজো

****

আজকে সরস্বতী পুজো ছিল 5th ফেব্রুয়ারী 2022এর। শেষ তিন সপ্তাহে অমিক্রনের তাড়নায় আশ্রমে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। প্রথমে কত্তামশাই অরিজিৎ আর মেয়ের হলো জানুয়ারি মাসের ১৮-১৯ তারিখে, তারপরে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে একদম শুইয়ে দিল আমাকে বিছানায়, উঠতে পারিনি, খেতে পারিনি, একদম শুয়ে পড়েছিলাম। ডাক্তার দেখিয়ে, এতো এতো এন্টিবায়োটিক গিলে, ওষুধ খেয়ে কিছুতেই ক্লান্তি কাটছে না কারুর, কাশছি থেকে থেকেই, এখনো এন্টিএলার্জিক চলছে ।এই কারণে টানা একমাস আশ্রমে যাইনি অথচ সারা জ্বরের সময়টায় শুধুই "মা" "মা" করে গুরুমাকে স্মরণ করেছি আর জ্বরের ঘোরে দেখেছি গুরুমা এসেছেন। আমার গুরুমায়ের সঙ্গে আমার সংযোগটা অনুভবের, উপলব্ধির-ভাষায় প্রকাশ করার নয়। ক'দিন ধরে মনে মনে ভাবছি এই শনিবার সরস্বতী পুজো, আমাদের জীবন্ত সরস্বতী গুরুমাকে দর্শন করলে বেশ হয় কিন্তু শরীর সত্যিই সারেনি।
কালকে সকালে গোপালকে স্নান করিয়ে ঠাকুরের পুজোয় বসব, গোপালকে স্নান করাচ্ছি, দেখি ফোন বাজছে, এসময় সাধারণত টেলিমার্কেটিংয়ের ফালতু কলগুলো আসে, তাই পাত্তা দিই নি। একটু পরে গোপালকে ফুলজল দিয়ে ফোনটা তুলে দেখি আশ্রম থেকে ফোন ছিল সেটা। সঙ্গে সঙ্গে ফোন ব্যাক করলাম আশ্রমে।ওখানে আমাদের জনৈক গুরুভগ্নী জানালো কালকে বিকেলে মা অবশ্যই যেতে বলেছেন আমাদের।

BANGLADARSHAN.COM

সেইমতো আজকে আমরা পৌঁছলাম আশ্রমে, গিয়ে শুনলাম আজকে বড়ো হলে প্রোগ্র্যাম, সাধারণত আমরা মায়ের একটা ঘরে রিহার্সাল করি। আমাকে প্রায় সঙ্গে করে নিয়ে মা ঢুকলেন আরো দু'তিনজনের সঙ্গে বড়ো হলে। মা আমার সাথে কথা বলতে বলতে ঢুকলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, মায়েরও শরীর খারাপ, সেসব বলছিলেন। এরপরে অরিজিৎ ঢুকলো, ওকে পিয়ানোটা সেট করে দিল একজন গুরুভাই। দেখলাম কিছু লোক এসেছে অনুষ্ঠান শুনতে। আমি দর্শক আসনে বসতে গিয়েও কী মনে হল মাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমি স্টেজে বসব কিনা। মা বললেন বসতে স্টেজে। এবারে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হল নামগান, ভজন দিয়ে, গোটা পাঁচেক গান হলো। পিয়ানো একোম্পানি করছেন আমার কত্তা শ্রীঅরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবারে মা একে একে আমাদের যে দিদি লিড করেন তাকে বললেন সোলো গাইতে, আরেকজন গুরুভগ্নীকে বললেন, আরেকজন মহিলাকেও বললেন, তারপরে আরো দুজন গাইলো সোলো। সবার সঙ্গেই অরিজিৎ বাজালো সঙ্গতে। এবারে আমি অনুমতি চাইলাম আমি গাইতে পারি কিনা, মা সম্মতি দিলেন এককথায়। যদিও শেষ একমাস হারমোনিয়াম ধরিনি বা রেওয়াজে বসিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য, তবু চেষ্টা করলাম। আজকে সঙ্গে তবলা নেই, পিয়ানো বাজাচ্ছে আমার কত্তা অরিজিৎ, আমি মাকে বললাম হারমোনিয়ামটা বাজিয়ে দিতে কারণ আমি যত ভালোই বাজাই না কেন, মায়ের যে স্বাভাবিক দক্ষতা আছে সঙ্গীতের সেটা আমার হবে না, মা সম্মত হলেন সঙ্গে সঙ্গে। চোখ বুজে ভৈরবীতে ধরলাম "তিমিরবিদারী অলখবিহারী কৃষ্ণমুরারী আগত ওই"....
তার আগেই মা বলেছেন আজকে শ্রীপঞ্চমী হলো কার্তিক আর দেবসেনার বিবাহের দিন। কার্তিক নারায়নের

অবতার আর দেবসেনা লক্ষ্মী। কার্তিকই পরে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার অর্থাৎ বাবাজী মহারাজ আর গাইছি বসে বাবাজী মহারাজের সামনে ।

আমার বহুদিনের ইচ্ছে ছিল আমি ওইখানে বসে গুরুমহারাজদের গান শোনাবো। আজকের মত একটা পবিত্র দিনে পরমেশ্বর পতিদেব গুরু আর দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর সহযোগিতায় এমন করে গান গাওয়া হবে কে জানতো!!! খুব নিষ্ঠা আর একাগ্রতা নিয়ে গাইলাম গান, তারপরে আর একটা সমবেত সঙ্গীত হয়ে অনুষ্ঠান শেষ হল।

বেরোবার আগে মা বললেন গানটা ভালো হয়েছে, ভালো লেগেছে শুনতে গান মায়ের। যাঁরা শ্রোতা ছিলেন আমাকে বললেন গান খুব ভালো লেগেছে, কারণ এতদিন দলে গেয়েছি ওখানে, এই প্রথম সোলো গাইলাম। একজন দেখলাম গুন গুন করছেন আমার করা গানটা। আমার জীবনের আরেক প্রাপ্তি এটা। বহুবার বহু জায়গায় গেয়ে প্রশংসা পেয়েছি গানের আগে, কিন্তু এখানে এই প্রথম একক সঙ্গীত এবং প্রশংসা প্রাপ্তি, তাও আমার গুরুমায়ের কাছে, একদম অভিভূত আমি।মা, সব গুরুমহারাজদের এবং আমার পতিদেবের চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম ২০২২ এর ৫ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পুজো আমার জীবনে একটা স্মরণীয় দিন করে দেওয়ার জন্য। জয় মা!!

🙏জয় গুরুমহারাজগণ!!🙏

BANGLADARSHAN.COM

॥গুরুকৃপাহি কেবলম (২)॥

গুরুসঙ্গ

*****

শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়ের জন্য সেতুনির্মাণ চলছে, নল ও নীল হল সেই সেতুর বানর স্থপতি বা ইঞ্জিনিয়ার, তাঁদের তত্ত্বাবধানে ভালুক, কাঠবেড়ালী, বানর আর অন্যান্য প্রাণী তাদের সাধ্যমত সাহায্য করছে, সবাই রামেশ্বরম থেকে রাম নাম লেখা শিলা তুলে তুলে সমুদ্রে ফেলছে আর শিলা ভেসে উঠলে সেটা জুড়ে দিচ্ছে সেতুর কাঠামোতে ধনুষ্কোটিতে। আস্তে আস্তে প্রস্তুত হচ্ছে সেতু লঙ্কাকে সংযুক্ত করতে যে সেতু ধরে রাম সুগ্রীবসহ বানর সেনা নিয়ে যাবেন সীতা উদ্ধার কল্পে শ্রীলংকায়। তদারকি করছে সেই সেতু নির্মাণের নল আর নীল ঘুরে ঘুরে। দ্রুত এগোচ্ছে কাজ, হাতে সময় কম।

শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ চেয়ে চেয়ে দেখছেন সবাই তৎপর এই সেতুর নির্মাণ তাড়াতাড়ি শেষ করতে। সাধ্যমতো সবাই শ্রমদান করছে। শ্রীরামচন্দ্রর মনে হল তাঁরও এই কর্মযজ্ঞে অংশ নিয়ে শ্রম দান করা কর্তব্য কারণ এরা খাটছে তাঁরই কার্য সিদ্ধি করার জন্য। শ্রীরামচন্দ্র এই ভেবে বেশ কয়েকবার শিলা এনে এনে ফেললেন সমুদ্রে কিন্তু দেখে আশ্চর্য হলেন যে তাঁর ফেলে দেওয়া শিলা একদম ডুবে গেল। দেখে তিনি ভীষণ হতাশ হলেন, মনখারাপও হল তাঁর। তিনি আর চেষ্টা না করে বিমর্ষচিত্তে একধারে গিয়ে বসলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের এই শিলা নিয়ে জলে ফেলা, তাদের ডুবে যাওয়া এবং তার ফলে রামের বিমর্ষতা সবই লক্ষ্য করছিলেন পবননন্দন রামগত প্রাণ হনুমানজী দূর থেকে, তিনি যে প্রভুগত প্রাণ।

রামকে বিমর্ষ দেখে তিনি এসে দাঁড়ালেন প্রভুর সন্নিকটে, বললেন, “প্রভু আপনি এতো বিমর্ষ কেন? কী হয়েছে?”

শ্রীরামচন্দ্র বললেন, “সবই তো দেখেছো, আমি ওদের সাহায্য করতে এলাম শিলা বয়ে জলে ফেলে কিন্তু আমার আনা শিলা জলে ডুবে গেল, কেন এমন হল তাই ভেবেই খারাপ লাগছে।”

হনুমানজী বললেন, “প্রভু, আপনি যাকে ধরেছিলেন তাকে ছেড়ে দিলে সে তো ডুববেই,আপনার হাত ধরেই তো সবাইকে ভবসাগর পেরোতে হয়, সেই আপনি কিনা ছেড়ে দিলেন শিলাদের, কেন প্রভু?”

এমনই হচ্ছে সদ্গুরুর সঙ্গ, সদ্গুরুর সঙ্গ যদি ছেড়ে যায় তো জীবের আর কোনো উপায় নেই, তাই জন্মজন্মান্তরে জীবের সঙ্গ সদ্গুরু ত্যাগ করেন না। সদ্গুরু ছেড়ে দিলে সে ডুববেই, তাই সদ্গুরুর সঙ্গ কখনো ছাড়া উচিৎ নয়।

সদগুরু ধরে থাকলে ঠিক ভবসাগর পার হবেই জীব। তুলসীদাসী রামায়ণের এই ঘটনা ব্যাখ্যা করতে বসে আমার গুরুমা তাই বললেন, “সদ্গুরুর সঙ্গ ধরে থাকলে ঝড়ঝাপ্টা আসবে না তা নয়, রোগ, ব্যাধি, শোক এসব প্রকৃতির অধীন। তাই সেই শক্তির ওপরে সর্বত্রব্যাপী গুরুশক্তি কখনো হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু সদ্গুরুর আশ্রয়ে থাকলে এমনিতে যেখানে গোটা মাথাটা কাটা পড়তো, সেখানে শুধু মাথার টুপি বা পাগড়িটা হয়তো কাটা পড়বে। যেমন কারুর বৈধব্যযোগ আছে কপালে, সেই বৈধব্যযোগ যেটা হয়তো তিরিশ বছর বয়সে ঘটতো, সেটা গুরুকৃপায় ষাট বছরে ঘটবে।নিয়তির বাইরে, প্রকৃতির নিয়মের বাইরে তিনি যাবেন না, কিন্তু সময়টা পিছিয়ে দিতে পারেন ফলে তিরিশের বৈধব্যে তার যে দুর্দশা হত, ষাটে কিন্তু তার দুর্দশার প্রকোপ অনেকটাই কমে যাবে।”

॥গুরুকৃপাহি কেবলম (৩)॥

মীরাবাঈয়ের জীবনের ঘটনা ও তাঁর বর্তমান রূপ

****

সৃষ্টির আদি থেকে যে যে দিব্যসত্ত্বারা ছিলেন, বারে বারে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়ে করে গেছেন জগৎ কল্যাণের কার্য প্রতি কল্পে প্রতি যুগে । যেমন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অগস্ত্য এযুগে এসেছিলেন ঋষি অরবিন্দ হয়ে, যাঁর শক্তিসত্ত্বা লোপামুদ্রা এসেছিলেন মীরা আলফাসসা শ্রীমারূপে, যেমন শ্রীবিষ্ণু এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে, তেমনই একটি সত্ত্বা মীরাবাঈয়ের যাঁর এটি বিখ্যাত ভজন।

মেরে তো গিরিধারী গোপাল দুসরো না কোই,
জাকে শর মোর মুকুট মেরে পতি সোই।
কোই কাহে কারো, কোই কাহে গোরো,
লিয়ন হ্যায় আঁখিয়ান কো...
কোই কাহে হালকো, কোই কাহে ভারো,
লিয়ন হ্যায় তরাজু টোল।
কোই কাহে ছানি, কোই কাহে ছাবনি,
লিয়ন হ্যায় পছন্ত টোল,
তন কা গহনা সব কুছ দিন
দিয়ো হ্যায় বাজুবন্ধ খোল।

BANGL

ওপরে উল্লিখিত ভজনটি মীরার ভজন যিনি কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন। মীরাবাঈ খ্যাত আমাদের দেশের ভক্তি আন্দোলনে তাঁর ভজন ও গিরিধারীলালের প্রতি প্রেমের জন্য। মীরাবাঈয়ের ভজন আমাদের সনাতন ভারতের ভক্তিমার্গের এক অমূল্য সম্পদ। মীরাবাঈয়ের জীবন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানি তবু তাঁকে স্মরণ করবার একটা কারণ আছে যা তাঁর সম্পর্কে একটু বলে অনুধ্যানের শেষে বলবো।মীরাবাঈয়ের এই প্রসিদ্ধ ভজন অনেকেই জানেন:

প্রীত করনা চাহি, প্রেম লাগানা চাহি,
ভজন করনা চাহি,
সাধনা করনা চাহি রে মানুয়া
ভজন করনা চাহি।
রসি পূজন সে হরি মিলে তো
ম্যায় পুজু তুলসী তাড়,
পাতথার পূজন সে হরি মিলে তো
ম্যায় পুজু পাহাড়।
দুধ পীনে সে হরি মিলে তো

বহুত গজরালা,
মীরা কাহে বিনা প্রেম সে
নেহি মিলে নন্দলালা।

মারোয়ার দেশে মেড়তা পরগনার অধিপতি ছিলেন একজন রাঠোর সামন্ত। তাঁর নাম ছিল রতন সিং। লোকে তাকে বলত রাতিয়া রাণা।

তারই কন্যার নাম মীরাবাঈ। মীরার জন্ম হয়, মেড়তা পরগণায়ই অন্তর্গত কুড়কি গ্রামে। মীরা বাল্যকাল থেকেই অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। যেই তাকে দেখত, সেই তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হত। এই সৌন্দর্যের সঙ্গে তার কণ্ঠস্বরে এমন এক মোহিনী মাধুরী এবং সঙ্গীতের সহজপটুত্ব ছিল যে তাতে তিনি সকলেরই অত্যন্ত আদরের ছিলেন। মীরা বাল্যকাল হতেই নির্জনে একাকিনী থাকতে ভালবাসতেন এবং আপনমনে গান গাইতেন। তিনি অন্য গানের চেয়ে হরিগুণ গাথাই গাইতে ভালবাসতেন।

তার আর একটি ভালবাসার সামগ্রী ছিল চন্দনচর্চিত পুষ্পমালা। মীরা বাল্যকালে কোন প্রতিবেশীর কন্যার বিবাহোৎসব দেখে নিজের মাতাজীকে জিজ্ঞাসা করেন–আমার স্বামী কে? মাতাজী কৌতুকছলে নিজেদের গৃহদেবতার বিগ্রহকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন–এই গিরিধারীলাল তোর স্বামী। বালিকা মীরা সেইদিন থেকে গিরীধারীলালকেই স্বামী জেনে হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভক্তি দিয়ে পূজা করতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে বিশ্বস্বামী মীরার পার্থিব স্বামীর আসন আগেই দখল করে বসলেন! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মীরার রূপ, গুণ এবং ভুবনমোহিনী সঙ্গীত-খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয় দুরান্ত হতে লোকে মীরাকে দর্শন এবং তার গান শুনে চরিতার্থ হবার জন্য কুড়কি গ্রামে এসে ভীড় করতে লাগলেন। মেরতা মাড়োয়ারের একটি তীর্থস্থানে পরিণত হল।

চিতোরের মহারাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র ভোজরাজ মীরার সুখ্যাতি শুনে তাকে দেখবার জন্য উৎসুক হলেন এবং একদিন ছদ্মবেশে মীরার পিতৃগৃহে গিয়ে মীরার রূপ দেখে এবং গান শুনে মুগ্ধ হলেন। দু' তিন দিন অতিথি হিসাবে থাকার পর বিদায় নিবার সময় আত্মবিস্মৃত হয়ে মীরার আঙুলে একটি মহামূল্য হীরকাঙ্গুরীয় পরিয়ে দিতে দিতে বললেন–"মীরা,তোমার সঙ্গ স্বর্গসুখতুল্য, মনোহর। এই স্বর্গ ছেড়ে চিতোরে যেতে মন চাচ্ছে না। তুমি যদি চিতোরের ভবিষ্যৎ রাজমহিষী হতে স্বীকার কর, তাহলে চিতোর ও মহারাণার কুল ধন্য হয়।" মীরার পিতৃদেব অতিথি পরিচয় পেয়ে আনন্দেই তাঁর হাতে কন্যা সম্প্রদান করলেন। স্বচ্ছন্দবিহারিণী বনের বিহঙ্গী হরিনী বন্দিনী হলেন স্বর্ণপিঞ্জরে।

মীরার শ্বশুরকুল শৈব। জনবাদ এই যে, মীরা শ্বশুরবাড়ীতে আনীত হলে তাকে কুলদেবতা মহাদেবকে প্রণাম করতে বলা হয়। তখন তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন–এক গিরিধারীলাল ছাড়া আর কাউকে প্রণাম করি না।

সেইদিন থেকে সুরু হল মীরার কপালে লাঞ্ছনাভোগ। চারিদিকে কেবল নিষেধের বেড়াজাল, এমন গলা ছেড়ে গান গাওয়া রাণীর সাজে না, এমনভাবে যখন তখন গান গাওয়া এবং ঠাকুর নিয়ে পড়ে থাকা কুলবধুর যোগ্য নয়, সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা চলবে না ইত্যাদি। মীরা দুঃখে ও ব্যথায় ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন। তিনি সদা-সর্বদা হরি-সংকীর্তনে মত্ত থাকায় স্বামী সেবায় ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। রাণা রুষ্ট হলেন। মীরা বৈষ্ণব মহাত্মা পেলেই তার সঙ্গে ভজনকীর্তনে মেতে উঠেন, এতে রানা মীরার চরিত্রে সন্দেহ করতে লাগলেন। রাণা পুনরায় বিবাহ করবেন বলে ভয় দেখালেন। তাতে বিনম্রভাবে মীরা বললেন–"মহারাণা, আপনি বিবাহ করলে আমি অত্যন্ত সুখী হব।" মীরার প্রতি রানার সন্দেহ আরও প্রবল হয়ে উঠল। এই সন্দেহের আগুনে বাতাস দিতে লাগলেন মীরায় ননদ শ্রীমতী উদাবাঈ ।

মীরার উপর দিনরাত গঞ্জনা ও নির্যাতন চলতেই থাকল। তিনি তার প্রাণের ঠাকুর গিরিধারীলালকে বুকে আঁকড়ে ধরে সব ব্যথা নীরবে সইতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে মীরার স্বামীর মৃত্যু হলে তার দেবর বিক্রমজিৎ মহারানা হলেন। তিনি মীরার সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ ও সাধন-ভজনে নানারকম বাধা সৃষ্টি করতে থাকলেন , ননদ উদাবাঈএর অত্যাচার চারগুণ বেড়ে গেল। মীরাকে মেরে ফেলার জন্য ফুলের ঝাঁপিতে ফুলের মধ্যে কালসর্প পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এক্ষেত্রেও ভক্তকে রক্ষা করলেন ভগবান। তার প্রাণঢালা ভক্তির গুণে তিনি ঝাঁপির মধ্যে পেলেন শালগ্রাম। এই অলৌকিক কাণ্ড দেখেও মহারাণা এবং তার ভগ্নির চোখ খুলল না, চৈতন্যোদয়ও হল না। তাঁরা সত্যসত্যই একদিন ঠাকুরের চরণামৃত বলে মীরাকে বিষ খাওয়ালেন।

চরণামৃত ভেবেই মীরা সাগ্রহে সেই বিষ পান করেছিলেন, কিন্তু তাতেও মহাসাধিকার কিছুই হল না, বরং তার ভগবৎ প্রেমের মাদকতা আরও বেড়ে গেল। তিনি হরিনামে দিনরাত্রি ডুবে থাকলেন।

এই সময়েই হরি ভজনে নিয়ন্তর ব্যাঘাত ঘটায় তিনি মহাত্মা তুলসীদাসজীকে পত্র লেখেন।

'ত্যজিনে তায় কোটি বৈরীসম, যদ্যপি পরম সনেহী', তুলসীজীর এই নির্দেশ পেয়েই তিনি আনন্দিত চিত্তে গিরিধারীলালকে বুকে নিয়ে চিরকালের জন্য চিতোর ত্যাগ করলেন। সেই সময়কার আর্তি ও গান মীরার সুধামাখা কণ্ঠে যেভাবে ফুটে উঠেছিল, তা শুনলে পাষাণও দ্রবিভূত হবে। এইসময় মীরাবাঈ গেয়েছেন-

তুম্হরে কারণ সব সুখ ছোড়া
অব মোহে কেঁও রসাবে।
বিরহ বিথা লাগি উর-অন্দর
পীত, সো তুম আয়ো বুঝাবো•••••

গানের বাণী আর কণ্ঠে যেন ফুটে উঠেছে কান্নার আবেগ, প্রাণে যেন হিল্লোল ওঠে। অমর্ত্যলোকের করুণ-স্নিগ্ধ-স্পর্শে সমগ্র সভায় আনন্দ শিহরণ!

স্বয়ং মীরাবাঈই গাইছেন-'তুম্হারে কারণ সব সুখ ছোড়া' হে আমার প্রীতম্ প্রিয়তম! ওগো তোমার জন্য যে আমি সব সুখ পরিত্যাগ করে এসেছি, এখন তুমি আমাকে গ্রহণ না করার ভয় দেখাচ্ছ কেন?
অন্তরের অন্তরে বিরহ ব্যথা উথলে উঠেছে, ওগো! এখন তুমি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরো, আমার জ্বালা নির্বাপিত করে–পীত, সোত আয়ো বুঝবে.•••••

কখনো তিনি উচ্ছসিত কণ্ঠে আবার গেয়ে উঠেছেন-
নয়ন ললচায়ত জিয়রা উদাসী ।
শ্যাওল বনমে বাজে শ্যাওল কী বশী।
মধু! মেরে মধু!
রৈনা-মে শয়না মে, মেরা নয়না না লাগে,
মেরা নীদ ন লাগে
পীতম কে শোয়াস অবে কুসুম-বাসী।
অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে -সংগীতের
জগতে মীয়ারাই, সুরদাস এবং তানসেনের মধ্যে কে বড়?

আমার বিচারে মীরাবাঈয়ের সাথে কারুর তুলনা হওয়া উচিতই নয়। হরবিলাস সর্দার কৃত 'মহারাণা সঁগা নামক পুস্তকে ১৭ ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময় কৃষ্ণগত মীরাবাঈ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার আগে পিছে অত্যল্প কালের ব্যবধানে বিরাজ করেছিলেন সংগীতগুরু তানসেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ সুরদাস ও তুলসীদাসজী। তানসেনের গুরু ছিলেন বৈজু রাওরা ও হরিদাস স্বামী। তিনি ছিলেন সংগীত জগতের সম্রাট। এক কথায় এইসর সর্বজনপূজ্য ভারত-সমসাময়িক ছিলেন, সকলেই ষোড়শ শতাব্দীর লোক। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সুরদাস তার প্রসিদ্ধ 'সুর সাগর' গ্রন্থে বহু ভক্তিমূলক গান রচনা করে গেছেন। তার ভক্তদের বিশ্বাস যে, সুরদাস উদ্ধবের অবতার ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সখা ভেবেই আজীবন পূজা করে গেছেন এবং পুষ্টিমার্গের সাধক বল্লোভাচার্য্য ছিলেন সুরদাসের সমজদার ও পৃষ্ঠপোষক, তিনি প্রভূত সম্মান করতেন নেত্রহীন সুরদাসজীকে তাঁর অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি ও কৃষ্ণময় ভক্তির জন্য। তানসেন সুরদাসের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তানসেন নওরতনের সামিল হয়ে প্রায়ই দিল্লীতে থাকতেন বলে সুরদাসের সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হত না।

বহুদিন পরে সুরদাসের একটি ভজন তানসেন গেয়ে খুবই পরিতৃপ্ত হন, তিনি দিল্লী থেকে সুরদাসকে চিঠি লিখে পাঠান,

'কি ধোঁ সুরকে শর লগেও কী ধোঁ সুর কি পীর,
কি ধোঁ সুর কি তন লগে তনমন দহত শরীর।"

'আজ আমার অঙ্গে কি সুরের (অর্থাৎ বীরের) তীর এসে বিধলো না সুর দাসের বিয়োগ-বেদনা ব্যথিত করল? আজ কি সুরদাসের সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে যে, আমার শরীরে একটি অনুভূতি জেগেছে?

উত্তরে সুরদাস লিখে পাঠালেন-

‘বিধনা এহ, জিয়া জান কর, শেষ ন দিন্হে কান,
খরা মেরু সব ডেলতে, তানসেন কি তান।’

‘বিধাতা একথা পূর্ব হতে জেনেই ত শেষকে (অর্থাৎ বাসুকী নাগকে, যার মাথায় এই পৃথিবী আছে) কর্ণ দান করেন নি। কেননা শেষনাগকে কান দিলে সে তানসেনের অপূর্ব সংগীত শুনে মাথা দোলাতো আর সমস্ত পৃথিবীটা দুলে উঠে সব চুরমার হয়ে যেত!

তানসেন প্রশংসা করেছিলেন সুরদাসের মধুনিষ্যন্দিনী ভাষার আর সুরদাস প্রশংসা করে পাঠালেন তানসেনের সুধানিন্দিনী সুর-মাধুর্যে।

এমনই ছিল উভয়ের মধ্যে উভয়ের নিবিড় অনুরাগ! কিন্তু কেউই কারুর সঙ্গে তুলনীয় নন, আপন আপন ভাবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে এঁরা প্রত্যেকেই এক একজন দিকপাল।

ঠিক এই রকমই অনুরাগ ও শ্রদ্ধা মহাযোগিনী মীরাবাঈ-এর সঙ্গে পত্র ব্যবহার ছিল মহাত্মা তুলসীদাসজীর। যখন কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী মীরাবাঈকে রাখার পক্ষ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও নির্যাতন করা আরম্ভ হল, তার সাধন পথের জয়যাত্রায় নানাবিধ বিপদ এসে পড়ল, তখন তিনি দুঃখ দুশ্চিন্তায় একেবারে ভেঙে পড়েন। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠির ভাষা সুরের যাদুতে ফুটে ওঠে। মীরার আর্তি যেন অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে লাগল-

‘শ্রীতুলসী সুখ নিধান, দুখহরণ গুসাই,
পায়ের পর প্রণাম করু, অবহরে শোকসমুদাই।
ঘর কে স্বজন হমারে যেতে সবনে উপাধি বঢ়াই,
সাধুসঙ্গ অরু ভজন করত মোহি দেত কলেশ মহাই।
বাল পনসে মীরা কীন্হা গিরিধরলাল মিতাই,
সো তে ছুটত নহি কৈঁসে, লগন লগি বরিয়াই।
মেরে মাতাপিতাকে সম হো, হরিভক্ত ন সুখদাই,
হকো কহা উচিত করিকে হয় সো লিখিয়ে সমঝাই।

অর্থাৎ হে দুঃখহরণ সুখনিধান গোস্বামী তুলসীদাসী! আমি বারংবার তোমাকে প্রণতি জানাচ্ছি। তুমি আমার সকল শোক হরণ করো। আমার স্বজন আমার মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করছে, তারা আমাকে ভজন করতে ও সাধুসঙ্গ করতে অনেক ক্লেশ দিচ্ছে। শৈশব হতে মীরা গিরিধারীলালের সঙ্গে প্রেম করেছে এবং তা ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও তা এখন ছাড়তে পারি না। তুমি আমার মাতাপিতা সদৃশ এবং তুমি হরি ভক্তদের পরম মঙ্গলকারি। তুমি আমাকে বুঝিয়ে লিখে পাঠাও, এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত।

এর উত্তরে গোস্বামী তুলসীদাসজী যা লিখে পাঠিয়েছিলেন, তাও একটি গান যা তুলসীদাসদীয় ভাষায় নিচে-

যাকে প্রিয় না রাম বৈদেহী।

সো ত্যজি কোটি বৈরীসম, যদ্যপি পরম সনেহী।
ত্যজে পিতা প্রহলাদ, বিভীষণ বন্ধু, ভরত মহতারী।
বলি গুরু ত্যজে, কান্ত ব্রজবনিতানি,
ভয়ে মুদ মঙ্গলকারী।
না তপ নেহ রাম সো মনিয়ত, সুহৃৎ সুসেব্য যহাঁলো;
অঞ্জন কহাঁ আঁখি সো ফুটে বহুতক কাহা কঁহালো।
তুলসী! সো সব ভাতি পরমহিত, পূজ্য প্রাণতে প্যারো;
যা সো হোয় সনেহ রামপদ,
এহি মতো হমারো।

‘তোমার নাম নেওয়ার পথে যে বাধা জন্মায়, সে যদি তোমার পরম-স্নেহের পাত্রও হয় তবুও তাকে তুমি কোটি বৈরী অর্থাৎ পরমশত্রু ভেবে অবিলম্বে ত্যাগ করবে। প্রহ্লাদ পিতাকে, বিভীষণ বন্ধুকে, ভরত মাতাকে, বলি গুরুকে, ব্রজবনিতারা নিজেদের স্বামীকে, ভগবদ-আরাধনায় বিঘ্ন হয় বলে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছিলেন এবং তাতে পরম মঙ্গল হয়েছিল।

চোখে জ্ঞানাঞ্জন লাগালে চোখের দীপ্তি উজ্জ্বল হয় এখং রামপদে ভক্তি বাড়াবার জন্য যদি পরম সুহৃদকেও ত্যাগ করতে হয় তবে তাও ত্যাগ করবে-আর আমি তোমায় কত বোঝাব। যে সব কাজ করলে নামের উপর তোমার অচলা ভক্তি হয় তা তুমি অবিলম্বে করবে-এই আমার মত।

তুলসীদাসজীর লেখা এই উত্তরের প্রচলিত পদটি আমার শেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার গুরুমা শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর কাছে। আমার গুরুমা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্যতম গায়ক পন্ডিত প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য ছাত্রী এবং তিনি স্বয়ং ভৈরবী রাগে সিদ্ধ এবং দশমহাবিদ্যা সাধনায় সিদ্ধ। এই গান শেখার সময় কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা সর্বাণী বলেছিলেন যে মীরাবাঈ মায়েরই একটা জন্ম, যেমন জনকনন্দিনী সীতা ও রামকৃষ্ণ জায়া সারদা মায়েরই আগের আগের জন্ম, মা নিজের আত্মদর্শন ও সাধনায় সিদ্ধিলাভের সময়ে এই জন্মগুলো দেখেছেন এবং বুঝেছেন আর বহুবার বহু সাধু মহাত্মা এসে বলে গেছেন যে মা সর্বাণী স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি, কৃষ্ণপ্রাণা শ্রীরাধিকা ।কিছু বছর পূর্বে পুস্করের মহাত্মা টাটবাবার গুরু রামায়েত সাধু বড়ে টাটবাবা এসে বলেছিলেন আশ্রমে,আমাদের তিনি শ্রীরাধার দর্শন করতে এসেছেন বললেন আর আমরা সবাই যারা মায়ের সঙ্গে আছি সবাই গোপিনী, শুনে আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। শ্রীশ্রী মা নিজে খুব সুন্দর মূর্তি গড়েন যার কিছু কিছু রাখা আছে মায়ের সেই ঘরে যেখানে বসে আমরা গান শিখি। সেখানকার শ্রীশ্রী মায়ের হাতে তৈরী মীরাবাঈয়ের মূর্তির ছবি নিচে দিলাম।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে শ্রীশ্রীমা সর্বাণী প্রকাশ করেছেন নিজের আদি সত্ত্বা। সেরকমই কিছু কথা বলছি নিচে :

• আমার একটা সময় খুব বাতিক ছিল তীর্থ দর্শনের, খালি মনে হত এখানে সেখানে যাই, যেতামও বিভিন্ন তীর্থস্থানে। একবার সেই প্রসঙ্গে বিন্ধ্যাচল যাবার কথা ওঠে। মাকে বলতে উনি বললেন, “কোথাও যেতে হবে না, আমার কাছে এসো, তোমার সব তীর্থ দর্শনের ফল হবে তাতে। গুরু চরণ পদ্মে সর্বতীর্থসার আছে।” সেবারের মত নিরস্ত হলাম।

• আরেকবার তারাপীঠ আর বৈষ্ণো দেবী দর্শনের কথা হচ্ছে, মা শুনলেন বসে, তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কী দেখতে যাবে?” আমি পরমাপ্রকৃতির তিনরূপ আর মহাবিদ্যার রূপ দেখার কথা বলতে আমাকে বললেন, “আমাকে দেখলে তোমার মা দুর্গার রূপ আর মহাকালী, মহালক্ষ্মী আর মহাসরস্বতী দর্শন একবারে হয়ে যায়, মা তারা, বিন্ধ্যবাসিনী আর আমি, আমরা তিনবোন,শুধু শুধু কষ্ট করে কেন যেতে চাইছো? জানো আমার বাবা তারাপীঠে খুব যেতেন, একবার ওখানে গিয়ে বাবার দর্শন হয় তারা মায়ের মধ্যে আমাকে। আমার বাবা তারপর থেকে আর তারাপীঠ যাননি।” আর যাওয়ার চেষ্টা করিনি।কোন জন্মের কোন পুণ্যে এমন গুরু হয়েছে আমার আমি জানিনা, অন্ততঃ এই জন্মে তেমন কিছু করেছি কিনা নিজেও জানিনা। শুধু জানি অনন্ত কৃপার সাগর আমার গুরু আর আমার তিনি জন্মজন্মান্তরের মা।

• এবারে কিছুদিন আগে কিছু কার্যোপলক্ষে গোয়ালিয়ারে একজন অবাঙালি ভদ্রলোক, যিনি নিজেও তন্ত্রসাধক ও জ্যোতিষ চর্চা করেন, মুখ দেখে অনেক কিছু বলতে পারেন, তিনি আমাদের কোষ্ঠী তৈরী করে দেখছিলেন, দেখে তিনি বিধান দিলেন আমার বগলামুখী সাধনা করা উচিৎ আর মেয়ের শিব আর দুর্গার পুজো করা উচিৎ শুক্রবারে আর মঙ্গলবারে। আমি শুনে এসে শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন, “যিনি বলেছেন তাকে বোলো যে স্বয়ং মা বগলামুখী আর দূর্গা তোমার গুরু যার কোলে তোমরা বসে আছো আর তোমরা নিজেরাও প্রণবের সাধনা করো, তাই এসব কিচ্ছু করতে হবে না।” আমি তখন বললাম, “এই কারণেই আমি ওনাকে বলেছি তোমাকে জিজ্ঞেস না করে কিচ্ছু করবো না।” আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, এই সাউথ ইন্ডিয়ান ভদ্রলোকের সাথে আমাদের বেশ সখ্যতা হয়ে গেছে, একদিন উনি এসে দেখালেন ওনার ওয়াল পেপারটা যিনি ওনার পরমগুরু, সেটা মহাবতার বাবাজী মহারাজের, সেটা দেখেই আমি ওনাকে বলেছিলাম, " Now I understand the connection why you became close to us." উনিও অবাক হয়েছিলেন।মহাবতার বাবাজী আমাদের পরমগুরু যাকে আমরা নিয়ত স্মরণ করি নারায়ণ শক্তি বা বিষ্ণুশক্তি হিসেবে ।কোথায় কার সাথে কার যে কিভাবে সংযোগ হয়ে যায়, কে ঘটায় ভাবতে বসলে বিস্মিত হওয়া ছাড়া আর কোনোই কার্য কারণ খুঁজে পাই না।

পরিশেষে আমার গুরু মায়ের ক্ষেত্রে সেই আবার বলতে হয়:

“গুরু আমার পরাণবন্ধু পারের কাণ্ডারি,
সুখের দিনে দুখের দিনে সাথে থাকেন,
আলো আমি যে দেখি তারই।”

জয় মা, জয় গুরুমহারাজগণ, জয় মহাবতার বাবাজী মহারাজ 🙏🙏🙏

গুরুপ্রসাদ

গুরুপ্রসাদ

॥দোলযাত্রা, গৌরপূর্ণিমা ও হোলি কথা॥

জয় জয়তী জয় যদুবংশভূষণ কৃষ্ণমাধব মোহনম
ত্রয়তাপখণ্ডন জগৎমন্ডন ধ্যানগম্য অগোচরম।
অদ্বৈত অবিনাশী অনিন্দিত মোক্ষপ্রদ অরিগঞ্জনম,
তব শরণভাবনিধি পারদায়ক পূর্ণব্রহ্ম সনাতনম।
দুখহীন দারিদকে বিদারক দয়াসিন্ধু কৃপাকরম,
ত্বম কৃষ্ণপ্রিয়কে কৃষ্ণজীবন মুরি মঙ্গল মঙ্গলম।
-শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

যুগে যুগে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন কৃষ্ণকে নানা ভাবে নানান উৎসবের মাধ্যমে আমরা ভজনা করে এসেছি। সেরকম একটি উৎসব দোলযাত্রা বা হোলি।

হোলির ভারতের অন্যতম জাতীয় উৎসব। তবে অনেকেরই অজানা এই উৎসবের শুরু কোথা থেকে হয়েছে। দৈত্যরাজের ছেলে প্রহ্লাদ ও তার বোন হোলিকার বিশেষ একটি ঘটনার থেকেই হোলির উৎসবটির সূচনা হয়। যাত্রা বলতে আমরা কি বুঝি? যাত্রার অর্থ হল কোনো লক্ষ্যবস্তুকে বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে নির্ধারিত পথে অভিষ্ট স্থানে পৌঁছে যাওয়া। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ‘দ্বাদশ যাত্রা’র কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তারমধ্যে বিশেষ কিছু হল ‘রথযাত্রা’, ‘রাসযাত্রা’, ‘দোলযাত্রা’, ‘স্নানযাত্রা’, ‘ঝুলনযাত্রা’ ইত্যাদি।

শাস্ত্রকাররা এসব যাত্রাগুলোকে বিশেষ ‘তাৎপর্যমন্ডিত’ ও ‘তত্ত্বসমৃদ্ধ’ বলে উল্লেখ করেছেন। অনাদি কাল থেকেই শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ রূপে মন্দিরে দেবালয়ে, ভক্তের গৃহে স্থায়ীভাবে পূজিত হয়ে আসছেন। রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ দোলনা বা ঝুলনায় স্থাপন করে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে দোলান হয়। এখানে প্রতীকী হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন - ‘পরা প্রকৃতি’ বা ‘পুরুষোত্তম’ আর রাধারাণী হচ্ছেন-‘অপরা প্রকৃতি’ বা ‘ভক্ত স্বরূপিনী।’ সূক্ষ্ম অর্থে ভক্ত ভগবানের খেলা। প্রশ্ন জাগতে পারে দোলায় রাধা গোবিন্দের বিগ্রহ স্থাপন করে পূর্ব-পশ্চিম দিক দিয়ে ঝোলানোর তাৎপর্য কী? এ বিষয়ে, ‘শাস্ত্রীয়’, ‘ভৌগোলিক’ ও ‘বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা’ও রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে দোলনাটি দোলানো হয় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। সূর্যের উদয় অস্ত ও অবস্থানের দিক নির্দিষ্ট করেই তা করা হয়। সূর্য হচ্ছে পৃথিবীতে সর্ব প্রকার শক্তির উৎস। আর পৃথিবীর গতি হচ্ছে - দু’টো, ‘আহ্নিকগতি’ ও ‘বার্ষিক গতি’। দুই গতিধারায় বছরে দু-বার ‘কর্কটক্রান্তি’ ও ‘মকরক্রান্তি’ রেখায় গিয়ে অবস্থান করে। তখন ঘটে সূর্যের ‘উত্তরায়ণ’ ও ‘দক্ষিণায়ণ’ অবস্থান। সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা অনুষ্ঠানে দোলনাটিকে ঝোলানো হয় উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে, দুলিয়ে দোল দিয়ে যাত্রা করে তাই দোলযাত্রা।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ যাত্রার অন্যতম প্রধান যাত্রা দোলযাত্রা। দোলযাত্রা বহুযুগ আগে থেকে ব্রজভূমি বৃন্দাবনে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা তাঁদের ‘অষ্টসখী’ - ‘ইন্দুরেখা’, ‘চিত্রা’, ‘চম্পকলতা’, ‘ললিতা’, ‘বিশাখা’, ‘তুঙ্গবিদ্যা’, ‘সুদেবী’ এবং ‘রঙ্গদেবী’র সাথে লীলা করেছিলেন ঐ দিনে।

গুরুপ্রসাদ

দোলযাত্রার আরেক নাম "বসন্তোৎসব"বা "বসন্তলীলা" আর ঝুলনের অপর নাম ‘হিন্দোলনলীলা’। ব্রজবাসীরা এই সময় কদমগাছে ঝুলা (দোলনা) বেঁধে রাধাকৃষ্ণকে দোল খাওয়ান।আর দোলে রাধাকৃষ্ণ খেলেন রং গোপিনীদের সঙ্গে।

কৃষ্ণকে আর রাধাকে নিয়ে গোপ সখা সখিরা সুন্দর সুন্দর ফুল পুষ্পমালা দিয়ে দোলনা সাজিয়ে দোলায় দুলিয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন।

শাস্ত্র মতে ‘রাধা’ হচ্ছেন ‘কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি মহামায়া।’ রাধা হচ্ছেন ‘কৃষ্ণ ভক্ত শিরোমনি।’ কৃষ্ণ শক্তিতে, কৃষ্ণপ্রেমে তিনি আরাধিতা ও বলিয়ান তাই তো তিনি রাধা। তাকে বলা হয় জীবজগতের প্রতীকী সত্ত্বা, কৃষ্ণ ভক্তের আরাধ্য দেবী। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তিতে তিনি বলিয়ান তাই রাধারাণীর কৃপা হলে অতি সহজেই কৃষ্ণ কৃপা হয়। আবার রাধা শক্তিতে কৃষ্ণ শক্তিশালী তাই তো তাঁরা উভয় মিলে এক ও অভিন্ন।

হোলি উৎসব ভগবান বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের কিংবদন্তির কাহিনির উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে আর দোল উৎসব কৃষ্ণ এবং রাধার প্রেমের কাহিনির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কৃষ্ণ এবং প্রহ্লাদ উভয়ই ঘটনাক্রমে ভগবান বিষ্ণুর অবতার হিসাবে বিবেচিত।

আসা যাক দোলযাত্রার কথায় যেহেতু এটি আমাদের বাংলারও অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব। বাংলার ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা রাতের পরের দিন দোল উৎসব পালিত হয়। দোলযাত্রা একটি হিন্দু বৈষ্ণব উৎসব। বহির্বঙ্গে পালিত হোলি উৎসবটির সঙ্গে দোলযাত্রা উৎসবটি সম্পর্কযুক্ত। এই উৎসবের অপর নাম বসন্তোৎসব। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুযায়ী, ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোলপূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবির বা গুলাল নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সঙ্গে রং খেলায় মেতেছিলেন। সেই ঘটনা থেকেই দোল খেলার উৎপত্তি হয়।

এই বিশেষ দিনেই, রাধা ও তাঁর সখীরা দল বেঁধে রঙ খেলায় মেতে উঠেছিলেন। তখন ভগবান কৃষ্ণ তাঁর মুখটি সুগন্ধি ফুলের কুড়ির রঙ দিয়ে গন্ধযুক্ত করলেন। কৃষ্ণ রাধার প্রতি সেই প্রথম প্রেম প্রকাশ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। এই মুহূর্তটি উদযাপন করার জন্য দু'জনকেই বর্ণময় পালকিতে নিয়ে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা নগর কীর্তনে বের হন। দোলায় বেরিয়ে যাত্রা করে আসেন রাধাগোবিন্দ, তাই এটা দোলযাত্রা।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে, কৃষ্ণ তার যৌবনে হতাশ হয়ে ভাবে, উজ্জ্বল বর্ণের রাধা ও অন্যান্য গোপিরা তার শ্যাম বর্ণের কারণে পছন্দ করবে কিনা। এতে কৃষ্ণের মা কৃষ্ণের হতাশায় ক্লান্ত হয়ে তাকে বলেন, রাধার কাছে গিয়ে সে রাধার মুখমণ্ডলকে যেকোন রঙ দিয়ে রাঙ্গিয়ে দিতে পারে। কৃষ্ণ তাই করে, এবং এরপর রাধা ও কৃষ্ণ জুড়ি হয়ে যায়। রাধা ও কৃষ্ণের এই রঙ নিয়ে খেলাই হোলি বা দোলযাত্রা হিসেবে পালিত হয়।

দোলযাত্রার দিন সকালে তাই রাধা ও কৃষ্ণের বিগ্রহ আবিরে স্নাত করে দোলায় চড়িয়ে কীর্তনগান সহকারে শোভাযাত্রায় বের করা হয়। এরপর ভক্তেরা আবির ও রং নিয়ে পরস্পর রং খেলেন।

"দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরই এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি।
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
আমাদেরই হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।"
-কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

দোল উৎসবের অনুষঙ্গে ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে দোলপূর্ণিমা বলা হয়। আবার এই পূর্ণিমা তিথিতেই চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম বলে একে গৌরপূর্ণিমা নামেও অভিহিত করা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ এবং ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা, যিনি ভগবতী শক্তি শচীমাতাকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই বঙ্গভূমে। গোবিন্দদাস কবিরাজ বালক নিমাইয়ের কথা এঁকেছেন তাঁর পদে এভাবে,

"খেলত শচী অঙ্গনে গৌরাঙ্গ
নিরখি নিরখি শচীমাতা সুত পাবতি,
বদন মনোহর ইন্দু
কুঞ্চিত অলক তিলক গোরোচন
শশী লাজত মুখ দেখ এন
কবহুক ঠাড়ে হো চেকী করত হ্যায়
বোলত মধুর ব্যান
দেখত বদন করৌ নিছাবরী
তাত মাত মুখ দেন।"

BANGL

সেই চৈতন্যলীলাকে বুঝতে গেলে বহু ভাগ্যে ভাগ্যবান হওয়া প্রয়োজন, রাধাকৃষ্ণ প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করা প্রয়োজন, তাই তো চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন,

"আজও সেথা নিভৃতে লীলা করেন গোরা রায়,
কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত তাই বৈষ্ণব শাস্ত্রের বিশেষ আদরণীয় কথাকাব্য।মহাপ্রভু বৃন্দাবনের দোল দেখে এসে বঙ্গদেশে দোলের প্রচলন করেন। দোলের আগের দিন সন্ধ্যেবেলা অনেক বাড়িতে ঠাকুরের অধিবাসের পর "ন্যাড়া পোড়া" হয়, যার সাথে হোলিকা দহনের সম্পর্ক নেই। "ন্যাড়া" এসেছে "ম্যাড়া" বা "মেন্টাসুর" থেকে। প্রাচীন কালে আকাশের একটি তারা দোলের আগের দিন পর্যন্ত দেখা যেত এবং তখন একে এক দৈত্য মনে করা হত, যা সূর্যকে উত্তরায়ণে আসতে বাধা দেয় বলে মনে করা হত। মনে রাখতে হবে সে সময় নতুন বছর শুরু হত এই সময়, এ ছিল নতুন ফসলের সময়। মেন্টাসুর বধ করে পরদিন কৃষ্ণের বিজয় উৎসবও দোল।

পরে চৈতন্যদেবের আরব্ধ কর্ম শেষ করতে আবির্ভাব ঘটে তাঁরই আরেকরূপ হরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের মুর্শিদাবাদ নিকটবর্তী ডাহাপাড়ায়, যিনি নিয়তই নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে লীলা করে গেছেন দুই বাংলায় এবং আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করে গেছেন। বন্ধুসুন্দর প্রভু জগদ্বন্ধুর কথা প্রচারে আনেন ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রভু দেহ রাখার পরে আর "বন্ধুলীলা তরঙ্গিনী" তে বিধৃত আছে তাঁর প্রত্যক্ষ লীলাগাথা, যেখানে জগদ্বন্ধু সুন্দরের কীর্তনে বলছেন,

জয় জয় গিরিধারী
জয় শ্রীগোবিন্দ গোকুল আনন্দ
গোপেন্দ্রনন্দন গোষ্ঠবিহারী।
চরণে নুপুর নখে নিশাকর,
চাঁচর চিকুরে চূড়া মনোহর
চমকে চন্দ্রকে, চপলা নিকর
কিবা রস চারু মুকুতা সারি।
নীল কুবলয়, বয়ান নয়ন,
নীরদ নবীন, জিনি সংহনন,
ভুরুযুগ কুসুমেষু শরাসন,
কটাক্ষে কাতর পুরুষ নারী।
গতি মত্ত করি, গলে বনমাল,
নাভি সুগভীর, শ্রীকর মৃণাল
কটী কক্ষ বক্ষ ভাল সুবিশাল,
কালিয় কুন্ডলী দমনকারী।
কিবা পীত ধরা পানি নির্মল
নাসা তিলফুল, কপোল কোমল
শ্রবণে কনক মকর কুন্ডল,
মঞ্জু কুঞ্জবন পুলিনচারী।
বিনোদ-মধুর -মুরলী অধরে,
রাধানাম সুধা বরষন করে,
গোপিকা প্রণয় সাগরে সন্তরে
জগৎ মানস তামসহারী।

BANGL

আবার কবে আবির্ভূত হবেন ধুলার এই ধরণীতে হীন পতিতের ভগবানের সেই অপেক্ষায় আমরা প্রাকৃতজনেরা বসে আছি।

হোলি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে হোলা থেকে। যার অর্থ হল আগাম ফসলের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। সংস্কৃত শব্দ হোলকা অর্থাৎ আধ পাকা শস্য থেকেও হোলি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। এখনও এই সমস্ত অঞ্চলে হোলির দিনে আধ পাকা গম এবং ছোলা খাওয়ার রীতি আছে।

রঙের এই উৎসব প্রথম শুরু হয় ঝাঁসির বুন্দেলখন্ডের আর্চ শহর থেকে। এক সময় এটি রাজা হিরণ্যকশ্যপুর রাজত্ব ছিল। দৈত্যরাজের ছেলে প্রহ্লাদ ও তার বোন হোলিকার বিশেষ একটি ঘটনার থেকেই হোলির উৎসবটি শুরু হয়।

ঝাঁসির সদর দফতর থেকে আর্চ শহরটি প্রায় ৭০ কিমি দূরে। এখানেই হোলির সূচনা হয়। পুরাণ অনুযায়ী, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশ্যপুর রাজধানী ছিল এই আর্চ। তিনি একটি বর পেয়েছিলেন যে, কোনও পশু বা মানুষ তাকে মারতে পারবে না কখনও এবং দিনে বা রাতে তার মৃত্যু হবে না। নিজেকে অমর মনে করে প্রচণ্ডভাবে দৃপ্ত ও উজ্জীবিত হয়ে সে।

হিরণ্যকশ্যপু স্বৈরাচার নিয়ম-কানুন করে রাজ্য শাসন করতে শুরু করেন। তার ছেলে প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী। ফলস্বরূপ হিরণ্যকশ্যপ বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেন প্রহ্লাদের প্রাণনাশের। কিন্তু বিষ্ণুর আশীর্বাদে তার কোনও ক্ষতি হয় না। এরপর এই প্রহ্লাদকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন হিরণ্যকশ্যপুর বোন হোলিকা। সেই উদ্দেশে প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয় সে। হোলিকা ভেবেছিলেন, তিনি তার মায়াবী ক্ষমতাবলে বেঁচে যাবেন এবং পুড়ে ছাই হয়ে যাবে প্রহ্লাদ। কিন্তু আসলে হয়েছে তার উল্টোটাই। বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের গায়ে এতটুকু আঁচ লাগেনি এবং আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় কাশ্যপ কন্যার। প্রহ্লাদকে বাঁচাতে বিষ্ণুর হোলিকা বধকে উদযাপন করা হয় এভাবেই। এরপরই ভগবান বিষ্ণু নরসিংহ অবতার ধারণ করে হিরণ্যকাশ্যপকে দিন ও রাতের সন্ধিকালে নখ দিয়ে রক্তাক্ত করে ধ্বংস করেন।

হোলি উৎসব হল ভগবান বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে কেন্দ্র করে যিনি রাক্ষস রাজা হিরণাকশীপুর ধর্মপ্রাণ পুত্র। বিষ্ণুভক্ত হওয়ায় প্রহ্লাদকে হত্যা করার জন্য, অতিপ্রাকৃত শক্তিধারী হলিকা-তাঁর সাথে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি নিজেকে বাঁচাতে তাঁর শক্তিগুলি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, প্রহ্লাদের মৃত্যু নিঃশ্চিত। তবে হোলিকার শক্তিগুলি তার “দুষ্ট” উদ্দেশ্যগুলির কারণে ব্যর্থ হয়েছিল এবং প্রহ্লাদ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আর্শীর্বাদে রক্ষা পান। হোলি, তাই, অশুভের উপরে শুভ শক্তির জয় উদযাপনের জন্য সারা বিশ্বে পালিত হয়। এই কারণের হোলির আগের দিন রাতে পালিত হয় হোলিকা দহন যা বাংলায় বুড়িঘর বা ন্যাড়াপোড়া নামে পরিচিত। বর্তমানে শুধু বুন্দেলখন্ড নয়, সমগ্র দেশেই হোলিকা দহনের রীতি পালিত হয়। প্রতি বছর আর্চের লোকেরা নাচে-গানে আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করেন এই উৎসব। মনে করা হয় সেখান থেকেই উৎপত্তি এই উৎসবের। আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে, ফাল্গুনী শুক্লা অষ্টমী থেকে শুক্লা চতুর্দশী সময়কালকে শাস্ত্রমতে হোলাষ্টক বলে, যে সময়ে যে কোনো শুভ কাজ করা বারণ, সেটা চতুর্দশীর দিন পর্যন্ত,সেই কারণেই সম্ভবত চতুর্দশীর দিন সব অশুভকে আবর্জনা হিসেবে পুড়িয়ে ফেলে "ন্যাড়াপোড়া"বা মেন্টাসুর বধ তত্ত্বের মহত্ত্ব বোঝাতে। পরেরদিন

গুরুপ্রসাদ

ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমা কিন্তু পুণ্য বা শুভ তিথি। আমাদের লক্ষ্মীর পাঁচালী তাই শুরু হয়েছে, "দোলপূর্ণিমা নিশি নির্মল আকাশ" দিয়ে।

আগামী শুক্রবার ১৮ই মার্চ,২০২২ এ দোলপূর্ণিমা। গোপিনীগণ সেদিন নিত্যধাম ব্রজধামে গাইবেন যা হরিদাস স্বামী, যিনি ছিলেন তানসেনে সংগীতগুরু, তিনি তাঁর পদে তুলে ধরেছেন এভাবে :

তন মৌজ ভরি মন মৌজ ভরি
পেয়ারি পিয়া সঙ্গ খেলত হোরি।
চোয়া চন্দন অর্গজাকে রং
ভরত ঝুরত দুহুঁ ডোরি।
অঙ্গ অঙ্গ সুখ রাখলৈ পরসত,
হাসত লসত মুখ মোরি।
শ্রীহরিদাসা ললিতা অদ্ভুত ছবি
নিরখি নিরখি তুন তোরি।

স্বামীজী একটি ভারী সুন্দর কথা বলেছিলেন সান্নিধ্য সম্পর্কে!! আকাশ থেকে পড়া বৃষ্টির একফোটা জল যদি হাতের পাতায় ধরা যায়, তা পানের যোগ্য হয়, যদি পদ্মপাতায় পড়ে টলমল করে আলো বিচ্ছুরণ করে, যদি নর্দমায় পড়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়, যদি নদী বা পুকুরে পড়ে তবে কাজে লাগে...!! আর কথিত যে যদি ঝিনুকের মধ্যে পড়ে তবে বালি সহকারে মুক্তো তৈরীতে কাজে লাগে...!!

তাই সান্নিধ্য বা সঙ্গ বড় মূল্যবান!! সাধুর সান্নিধ্য কিছুক্ষণ লাভ করলে জগত অসার মনে হয়...!! কোনো জাগতিক সফল মানুষের সান্নিধ্য পেলে মনে হয় জীবনে সফলতা লাভ করাই একমাত্র উদ্দ্যেশ্য...!! ধনীর সাথে থাকলে ধনী হবার বাসনা হয়...!! ভক্তের সান্নিধ্যে এলে ভগবানকে মনে পড়ে...তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে...!! বিষয়ীদের সান্নিধ্যে থাকলে বিষয়বিকার ভক্তিকে গ্রাস করে...!! বহুসঞ্চিত "ভাব" অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়...!! ঠিক যেমন গরীব আত্মীয় বড়লোক আত্মীয়ের সাথে বেড়াতে গেলে তার কষ্টার্জিত সঞ্চিত টাকাগুলো জলের মতো খরচ হয়ে যায়!!! "ভাব" রক্ষা তাই ভক্তের কাছে বড় সাধনার ব্যাপার...কথায় আছে "রাজা হওয়া কঠিন, মুকুট রক্ষা করা আরও কঠিন"... আধ্যাত্মিক রাজ্যেও একথা বড়ই সত্য...!! আবার স্বয়ং জনার্দন ভাবগ্রাহী। সান্নিধ্য এমন করে উৎকর্ষতা বা নিম্নগামিতা দেয় যা অভাবনীয়...!!! ভেবেচিন্তে তাই "সান্নিধ্য" বেছে নিতে হয়...!!! জীবনের শেষ মুহূর্তে কিন্তু ব্যকরণসূত্র সত্যিই কাজে লাগে না..(জাগতিক ধন ও বিদ্যা)....আচার্য শঙ্কর শিখিয়ে গেছেন....! এইজন্যই তিনি বলেছেন, "ভজ গোবিন্দম, মূঢ়মতে...." সেখানে লাগে ভক্তি..ভাব...ভালোবাসা....!!

এইজন্যই বলে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

পরিশেষে এমন ভেষজ আবীর বা এমন আবীর যা খাওয়াও যাবে তার পদ্ধতি বলি যা প্রাপ্ত হয়েছি এক অতীব গুণী অনুজের কাছ থেকে :

* অ্যারারুট/ময়দা + ফুড কালার= আবির
* অ্যারারুট/ময়দা + বিটের রস = আবির
* বেসন + হলুদ = আবির
* ময়দা + সবুজ মেহেন্দি = আবির
* শুকনো জবা + ময়দা = আবির

এরসঙ্গে আতর মেশালে সেটা সুগন্ধি আবীর হবে।

সবার মনে ভগবতপ্রেমের চিরন্তন রং লেগে দোল সার্থক হয়ে উঠুক এই কামনা করি।

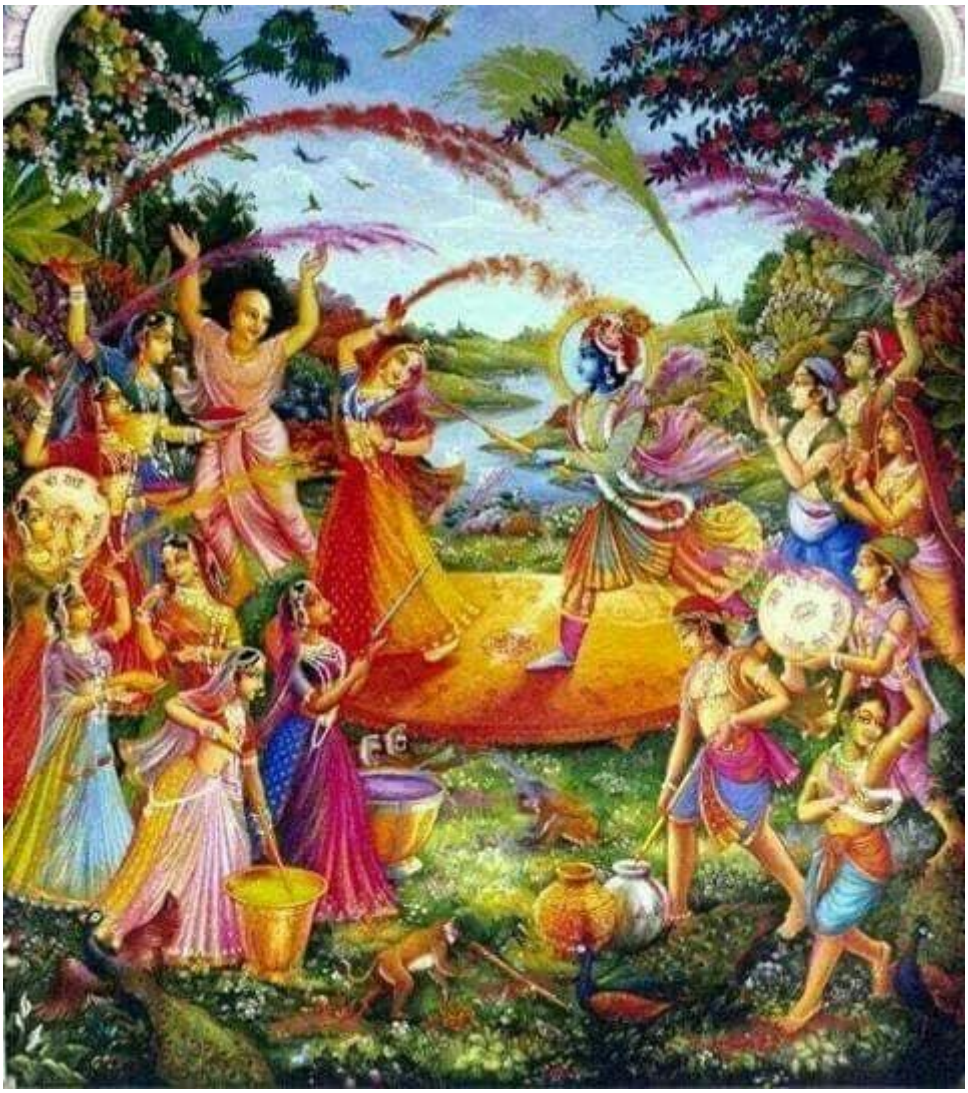

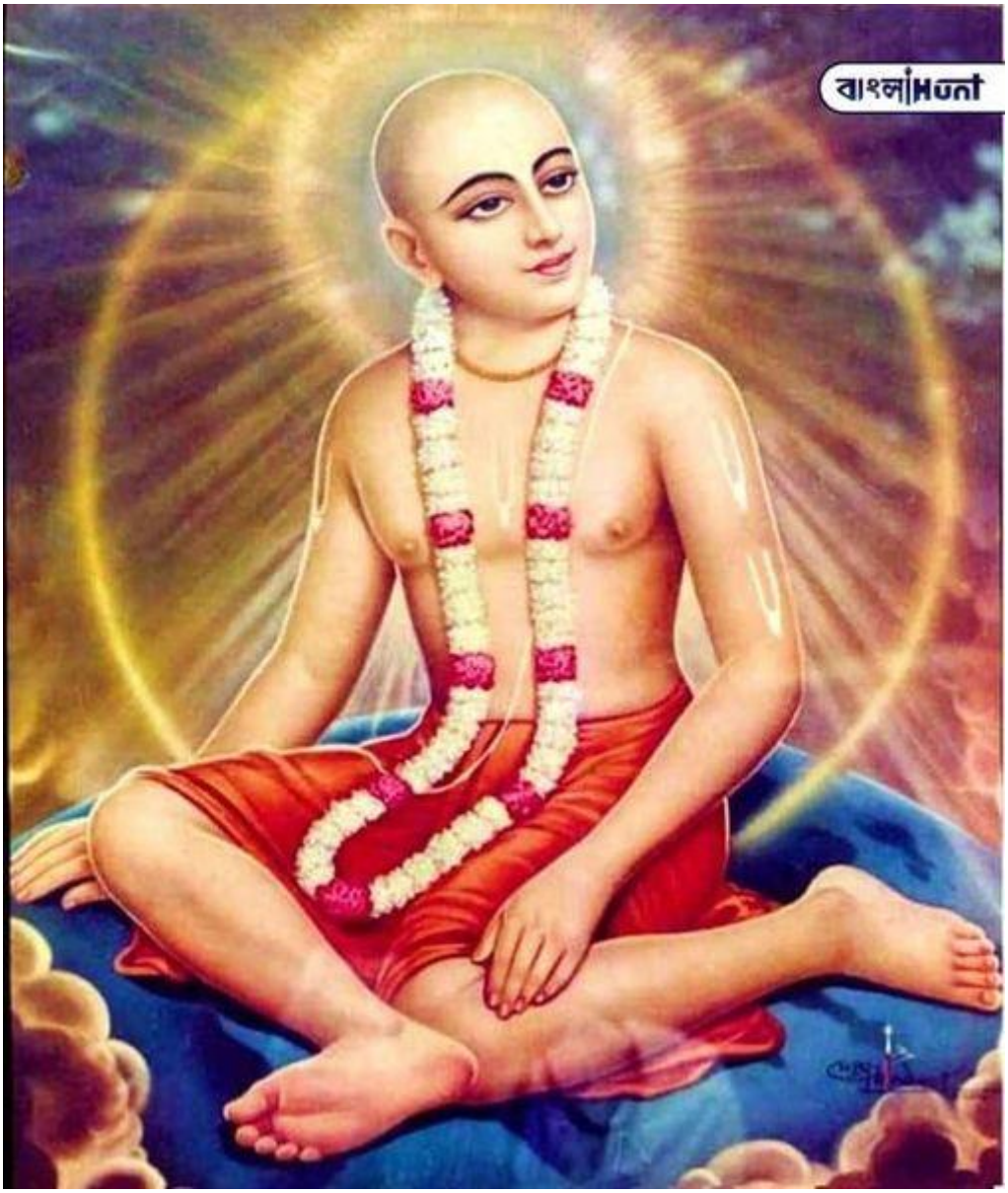
বাংলাHunt

গুরুপ্রসাদ

ব্রজে হোলি দর্শনে গোপিনীগণ

নন্দকুমার খেলিছে রাধাসনে
যমুনা পুলিনে সরস রঙ্গহোরি,
নব ঘনশ্যাম মনোহর রাজত
অতি সৌভাগ্য তনু দামিনী গোরি।
কেসরের রঙে কলসভরে বহু
সঙ্গে সখা হলধরের জুড়ি,
হাতে নিয়ে কনক পিচকারী
ছেটায় ব্রজরাজে নওলকিশোরী।
চারু আবীর উড়ত নাচত
কটিতে বেঁধে গুলালের ঝারি,
মগন হয়ে ক্রীড়ত সব সুন্দরী
প্রেম সমুদ্রে ঝাকি তরঙ্গ ভারি।
বাজত চোঙ মৃদঙ্গ আর ঘটি
পটে ঝাঁঝ ঝালর শিরোপরি,
তাল রবাব মুরলীকা বীণা
মধুর শব্দের উঠে ধুনি উপরি।
অতি অনুরাগ বাড়ে তিথি অবসর
কুল লজ্জা মর্যাদা উড়িয়ে তুড়ি,
মদনগোপাল লাল সনে বিহরত
দেহ দশা ভুলি ভঙ্গ সব বৈরী।
এক মুগ্ধ দেখে ফোঁটা ফাগুয়ারি
এক করত ত্রিভঙ্গ ঠামে ঠেহড়ি,
এক আঁখি আবেশে হয় ভাঁজ
এক অবলোকনে মুখ সুখে ওঠে ভরি।

BANGL

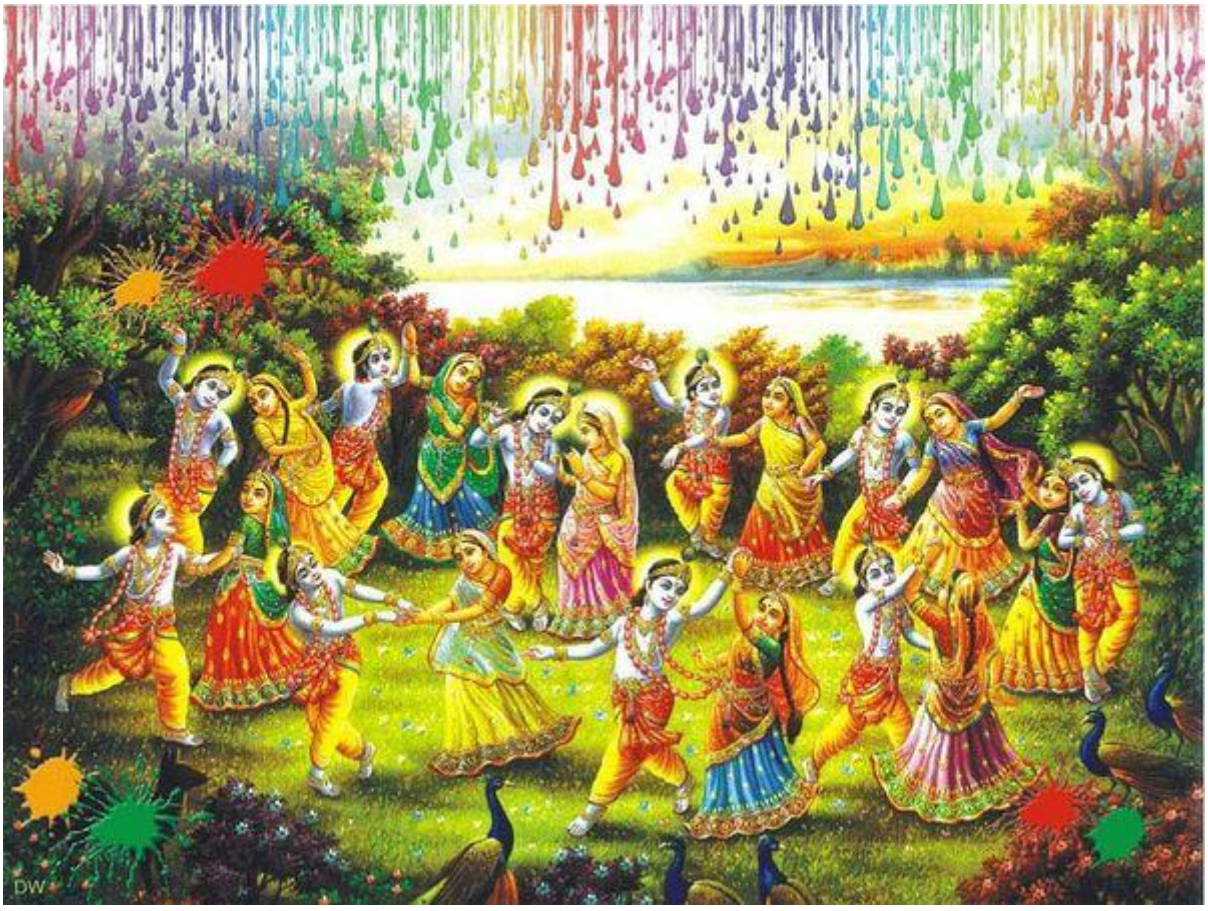
DW

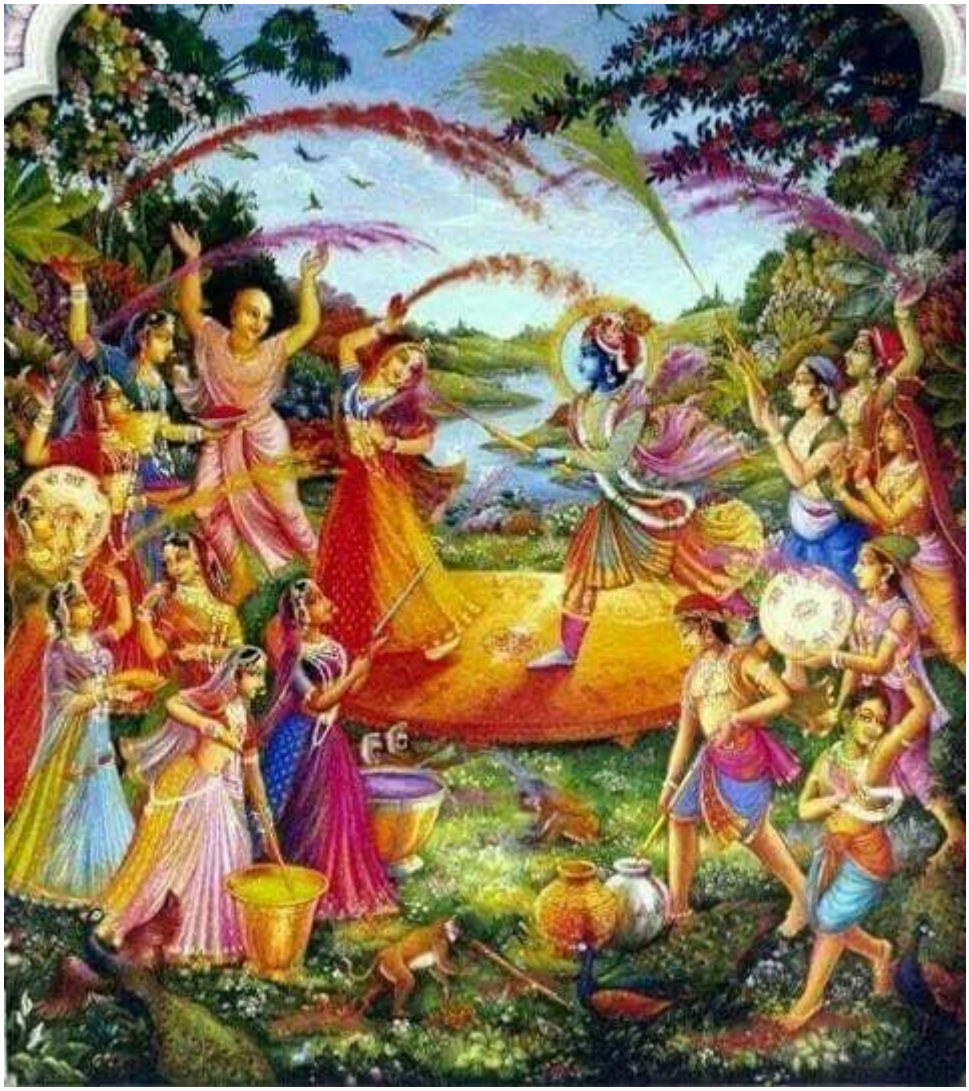

প্রাণ হরণ

সূক্ষ্ম পরাণ পাখি আমার আছে দেহপিঞ্জরে বান্ধা,
লক্ষ্য তাহার খেচর পানে, তারই লাগি সকল কান্দা,
রূপায় মুড়ে সোনার শিকলি যতই তারে দাও,
রাজার ঐশ্বর্যে যতই তারে মোহিত করতে চাও,
বন্ধনের সে পাশ কাটিয়া ওড়ার যে তার ধান্দা।
নীলিমায় নীলের মাঝে ওড়া স্বাধীন সে বাউল প্রাণ,
মনপবনের ডানায় ভর দিয়ে পঙ্খী হয়ে যায় মন,
মেঘের বুকে ডানা ভাসিয়ে উর্দ্ধে ওড়ে সে যে,
রোদ্দুরের সোনা মেখে নেয়, অসীমেতে চেয়ে,
গঞ্জে গাঙে গ্রামে দেশে দেশান্তরে ঘরছাড়ার তার টান।
আমার সে মনপাখিকে বান্ধিতে চাই সতত গৃহাঙ্গনে,
তারে বান্ধিতে গিয়ে আটকালাম বিষম মায়ার বন্ধনে,
সে বন্ধনেও আছে যে গো মুক্ত হওয়ার পথ,
সে পথেও যে দয়াল আসেন নিয়ে তাঁর স্বর্ণ রথ,
আপন স্বরূপ চিনিতে সে পথ মেলে দয়াল কৃপায় সাধনে।
মন একতারায় বাজে আজকে কেন ব্রজপুরের সে সুর?
যে সুরের জাদুতে রাধা আকুল, গোপ গোপিনী বিভোর,
মোহনরূপে বাঁকা ঠামে বিরাজে মদনগোপাল,
মন যে হল ব্রজের কুঞ্জ, পায়না সে কোনো তল,
মধুর মাধুর্যভাবে মধুমাসের অবসরে প্রাণ হরিল ননীচোর।

BANGLADARSHAN.COM

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥